15 March 2018 02:51

বঙ্গবন্ধু, বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমেদ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

☐ • বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক দর্শন এর ব্যক্তি শেখ মুজিবের আদর্শকেই মনে হয় বেশী ভালোবাসতেন তাঁরই রাজনৈতিক সহকর্মী বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমেদ। ব্যাক্তি হিসেবে তাজউদ্দীন সাহেব ছিলেন নির্লোভ একটু বামঘেষা একজন মানুষ তাই তাঁর সমসাময়িক সকল রাজনৈতিজ্ঞ গণের কাছেই তিনি ছিলেন গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি এবং মাওলানা হামিদ খান ভাসানীর খুব

প্রিয়পাত্র ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূতিকাগার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তারপরবর্তী সকল আন্দোলন সংগ্রাম অনুপ্রেরণা হিসেবে ভাষা শহীদগণের আত্মবলিদান হিসেবে কাজ করেছে যা পরবর্তীতে প্রথমে স্বাধিকার ও স্বায়ত্ত শাসন পড়ে স্বাধীনতা আন্দোলন এ রূপ নেয়। ১৯৪৯ সালে তেইশে জুন পাকিস্তান জন্মের মাত্র ২ বছরের মাথায় পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিমলীগ নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয় এবং এর প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন মাওলানা হামিদ খান ভাসানী এবং এর লক্ষ্যই ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব এর ভিত্তিতে গঠিত হওয়া পাকিস্তানের মুসলিম মৌলবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

বাঙালি জাতির স্বকীয়তা প্রকাশ। তাই এর দ্বিতীয় কাউন্সিলেই দলটির নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তান আওয়ামীলীগ রাখা হয় এক কথায় আওয়ামীলীগ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ, বামঘেষা উদার একটি রাজনৈতিক দল। ১৯৫৬ সালে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির সাথে যুক্তফ্রন্ট করে সরকার ও গঠন করে এই আওয়ামীলীগ কিন্তু সরকার গঠনের কিছু সময় পরই সরকারের সাথে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় দল থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন মাওলানা ভাসানী এই কারণে তিনি স্বেচ্ছায় আত্মগোপন এ যান তখন আওয়ামীলীগ এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান এবং মন্ত্রীসভার ও সদস্য ছিলেন। মাওলানা সাহেবের অবস্থান শেখ মুজিব জানতেন এবং তাকে

আত্মগোপন থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন এবং এর দায়ীত্ব অর্পণ করেন তার নির্ভরযোগ্য সহকর্মী তাজউদ্দীন আহমেদ উপর এবং মাওলানা সাহেব দল থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং পরবর্তীতে আওয়ামীলীগ এর কর্ণধার হলেন শেখ মুজিবর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হোন তাজউদ্দীন আহমেদ।
স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন এর দাবীতে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ছয়দফা আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং তারসাথে একাত্বতা ঘোষণা করে ছাত্রনেতা সিরাজুল ইসলাম এগারো দফা যোগ করেন। স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের সরকারের বিরুদ্ধে এই ছয়দফার দাবীতে ধর্মঘট, হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলেন

ফলে আইয়ুব খান বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে ঘায়েল করতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামক রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার করেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার নামে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পায়তারা করতে থাকে, অন্যাদিকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন এই সেই তাজউদ্দীন আহমেদ এবং এই আন্দোলন ই আইয়ুব শাসনের পতন ঘটায় যা ১৯৬৯ এর গণ আন্দোলন নামে ইতিহাস খ্যাত। অই গন আন্দোলনে শহীদ হোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মাস্টার্সের শেষ বর্ষের ছাত্র নরসিংদীর কৃতি সন্তান শহীদ আসাদ। আইয়ুব শাসনের অবসান হয় জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক আইন জারির মাধ্যমে এবং তখন শুরু হয় গণতন্ত্র উদ্ধারের

আন্দোলন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া বাধ্য হয় ১৯৭০ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে আর শহীদ আসাদের রক্তমাখা জামা এই ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগ কে নিরঙ্কুশ বিজয় এনে দেয় কিন্তু সামরিক শাসক ইয়াহিয়া নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরু করে........ আর বাংলার ছাত্র জনতা গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে ১৯৭১ এর মার্চ মাসের ১ তারিখে, মার্চের ১ তারিখে পলটনে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু এবং তার পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন হাওয়াই শার্ট পড়া সকলের প্রিয়মুখ তাজউদ্দীন আহমেদ। উপস্থিত বিশাল জনতা স্লোগান দিতে থাকে "বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো "

তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা " তুমি কে আমি কে?? বাঙালি! বাঙালি! এই স্লোগান সম্মিলিত পোষ্টার ব্যানার হাতে নিয়ে আন্দোলন এ ঝাঁপিয়ে বাঙালিরা। ঢাকসু ভিপি আসম আব্দুর রব বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তোলিত করেন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা, একই দিন ময়মনসিংএর মুক্তাগাছায় পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা, এভাবেই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এবং দৃঢ় নেতৃত্বে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বাংলার সর্বস্তরের জনগণ। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ ই মার্চ ততকালীন রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে আওয়ামীলীগ এবং ধানমন্ডীর ৩২ নম্বর সড়কের ৭ নম্বর বাড়ি থেকে

জনসভা স্থলে উপস্থিত হোন বাংলার প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু বিশাল জনতার ভীরকে পাশকাটিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে মঞ্চে উঠেন তাজউদ্দীন আহমেদ। আর উপস্থিত জনতার মুখে একটাই স্লোগান বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু সেই ঐতিহাসিক ভাষণ দেন " এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম " এবং জনগণকে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ প্রদান করেন। মঞ্চে উপবিষ্ট তাজউদ্দীন সাহেব লক্ষ্য করলেন সকল জনগণের প্রত্যাশা ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা। যাইহোক একদিকে আন্দোলন অন্যদিকে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে

থাকলেন বঙ্গবন্ধু। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় আসে মার্চের ২৩ তারিখে এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য এবং ইইত আনতে

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাত ৮ টার কিছু পর বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমেদ বঙ্গবন্ধুর সাথে জরুরী ভিত্তিতে দেখা করতে যান, ডঃ কামাল আহমেদ পূর্বথেকেই সেখানে ছিলেন। এরই মধ্যে ধানমাণ্ডির ৩২ নম্বর সরকে সেনা টহল বাড়তে থাকে, রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছিল। তাজউদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুকে আত্মগোপনে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি তাতে সম্মতি দেননি এবং বলেছিলেন "আমাকে তোরা কোথায় লুকিয়ে রাখবি আমাকে না পেলে তারা আমার জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করবে। " তারপর

মনখারাপ করে তাজউদ্দীন আহমেদ বসেছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন আহমেদ কে নির্দেশ দিয়েছিলেন " পাকিস্তান আর্মি যদি আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং আমি যদি আর কোন নির্দেশনা দিতে না পাড়ি তুমি আত্মগোপন এ গিয়ে আমার পক্ষথেকে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করবে "। তারপর তাজউদ্দীন সাহেব তার একান্ত বিশ্বস্ত সহচর ব্যারিস্টার সৈয়দ আমির-উল-ইসলাম এর সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন আত্মগোপন এ যাওয়ার এবং ব্যারিস্টার সাহেবকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে বঙ্গতাজ কিছু জরুরি জিনিসপত্র আনতে যান আর মিনিট তিরিশেক পরেই তিনি ফেরত আসেন সাথে একটি ছোট ব্যাগ আর কাঁধে ঝোলানো একটা রাইফেল নিয়ে। ততক্ষণে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির চারপাশ ঘিড়ে ফেলেছে পাকিস্তানি আর্মি, তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপন করাই ছিল

একমাত্র কাজ কিন্তু কাঁধে ঝোলানো রাইফেলটা তখন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়... তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে ধানমাণ্ডির ৩২ নম্বর সরক থেকে সাতমসজিদ রোডের একটি টিনশেড বাড়িতে আশ্রয় নেন তাজউদ্দীন আহমেদ এবং আমির-উল-ইসলাম, বাড়িটি ছিল ব্যারিস্টার সাহেবের একবন্ধুর বাড়ি। ততক্ষণে অদূরেই পিলখানা ইপিআর হেডকোয়ার্টার থেকে ভারী মোশিনগানের গুলির শব্দ ভেসে আসছিল, ইপিআর এর অবাঙালি সদস্যরা ওয়াচটাওয়ার দখল করে ঘুমন্ত বাঙালি সৈনিক ছাউনির উপর গুলিবর্শন করতোছিল অনেক বাঙালি সৈন্য নিহত হয় এবং অনেকেই জীবন নিয়ে পালিয়ে আসতে পেড়োছিল। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে বাঙালি অফিসার এবং কনস্টেবলরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল এবং পুলিশের ১৫৭ জন সদস্য শহীদ হোন সে রাত্রে। পাকিস্তানি বর্বর

বাহিনী সে রাতের অপারেশনকে নাম দিয়েছিল অপারেশন সার্চলাইট আর এর নামে সমস্ত ঢাকা শহর জুড়ে নারকীয় গণহত্যা চালায়, সেনারা প্রথমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর জগন্নাথ হলে গণহত্যা চালায় তারপর এক এক সকল হলে চালায় বর্বর হামলা, ধরে নিয়ে যায় রোকেয়াহল থেকে ছাত্রীদের। বঙ্গতাজ এবং ব্যারিস্টার সাহেব নির্ঘুম রাত কাটান ২৫ শে মার্চ রাত্রিতে। (এখানে উল্ল্যেখ্য করা প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু ২৬ শে মার্চ হরতাল ডেকেছিলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সে হরতাল প্রত্যহারের সূযোগ তিনি পাননি তাই মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার নির্দেশাবলী এবং এর দায়ীত্ব তার একান্ত সহচর বঙ্গতাজের উপর ন্যস্ত করে যান। এখানে অনেকেই ইতিহাস বিকৃতি করে যে যার মতো করে লিখে যাচ্ছেন। কেউ বলেন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার থেকে বঙ্গবন্ধু ওয়ারলেস এ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান, ইপিআর

হেটকোয়ার্টারের নিয়ন্ত্রণ অবাঙালিদের হাতে ছিলো তাই ইপিআর এর রেডও এর মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার ভিত্তিহীন ই মনে হয় বিশেষ করে আমার কাছে। বরং ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ততকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানেই তিনি স্বাধীনতার চুরান্ত ঘোষণা দিয়েছিলেন "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম " কথাটির মাধ্যমে।) তারপর ২৬ শে মার্চ সকালে ছদ্ধবেশ ধরার জন্য ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম তার বন্ধুর ব্যবহৃত পুরনো ব্লেড দিয়ে দাড়িগোঁফ কেটে ক্লিন সেভ করে ফেলেন এবং পাকিস্তানি আর্মি কার্ফিও শিথিল করলে বাজারের থলে হাতে নিয়ে বঙ্গতাজ এবং তিনি মুন্সিগঞ্জের উদ্দেশ্যে পায়ে হেটেই রওয়ানা দেন পথিমধ্যে বুড়িগঙ্গা পাড়হওয়ার সময় স্থানীয় এক আওয়ামীলীগ নেতার হাতে একটা চিঠি

দিয়ে যান তাজউদ্দীন আহমেদ তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। এভাবে তার মুন্সিগঞ্জ পৌঁছেন এবং স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীরা তাদের স্বাগত জানায়, ২৬ তারিখ তারা মুন্সিগঞ্জ হয়ে ফরিদপুর পৌঁছান এবং সেখানকার এক আওয়ামীলীগ নেতার বাড়িতে রাত্রিযাপন করেন। রাতে স্থানীয় নেতা কর্মীরা বর্তমান পারিস্থিতির আলোকে কি করনীয় তা জানতে চেয়ে নির্দেশনা চাইলে বঙ্গতাজ প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। ২৮তারিখ সকালে ফরিদপুর থেকে ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পদ্মানদী পাড়ি দেওয়ার সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণাটি শুনতে পান সেটা ছিল এমন " ।

major ziaur rahman hereby declare the independence of the people republic of Bangladesh, by the name of great leader bangabondhu sheikh mujibor rahman I call upon all bangalies to raise against Pakistan army, we'll fight our last, victory is by the grace of Allah ". মেজর জিঁয়ার এই ঘোষণাটি উপস্থিত জনসাধারণকে উজ্জীবিত করেছিল বলে ব্যারিস্টার সৈয়দ আমির-উল-ইসলাম তার " মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি " নামক গ্রন্থে উল্লেখ্য করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এটা অপরিহার্য অঙ্গ এটা অস্বীকার করার সুযোগ নাই। এভাবে পায়ে হেটে বঙ্গতাজ এবং ব্যারিস্টার সাহেব ৩১ তারিখে কুষ্টিয়া সীমান্তে পৌঁছেন এবং সেখানকার মহকুমা প্রশাসক এর সহযোগিতায় সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছেন। সেখানে পৌছলে বি.এস.এফ এর ততকালীন মহাপরিদর্শক গোলক মজুমদার তাদের সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাদের প্রথমে গোসলের ব্যবস্থা করে দেন। এখানে বলাবাহুল্য যে বঙ্গতাজ এবং ব্যারিস্টার আমিরুল সাহেবের পরিধেয়

কাপড় চোপড় এমন বেহাল অবস্থা হয়ে গেছিল যে তা নিয়ে কারোও সামনে যাওয়ার অবস্থাও ছিলনা, গোলক মজুমদার তাদের জন্য নতুন জামাকাপড় এর ব্যবস্থা করেন এবং তাদের রাতের খাবারদাবার এর ও ব্যবস্থা করেন। তারপর তখনকার বি.এস.এফ এর মহাপরিচালক রুস্তমজী ও তাদের সাথে দেখা করতে আসলে জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ তাকে অনুরোধ করেন বাংলাদেশের গেরিলাদের অস্ত্র এবং ট্রেনিং এর সুযোগ করে দিতে, প্রতিউত্তরে রুস্তমজী বলেছিলেন ভারত সরকারের অনুমতি ছাড়া তা সম্ভব নয়। তখন তাজউদ্দীন আহমেদ ভারতের ততকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন শ্রী গোলক মজুমদার এর কাছে। তারপর লেঃকঃ গোলক মজুমদার জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ এবং তার সহচর ব্যারিস্টার আমিরুল সাহেব কে বিশেষ

বিমানে করে (বিমানটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যদের রসদ বহনকারী একটি বিমান) ১৯৭১ সালের ৩ তারিখে দিল্লী নিয়ে যান এবং ভারতের ততকালীন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। শ্রীমতী গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে বঙ্গতাজ তার একান্ত সহচর ব্যারিস্টার সাহেবের সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবেই ভারতের সরকার প্রধানের সাথে কথা বলবেন। সাক্ষাতে তাজউদ্দীন সাহেব শ্রীমতী গান্ধীকে বলেন ক্যান্টনমেন্ট বাদে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল ই মুক্ত এবং জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলছে, যতক্ষণ পর্যন্ত পাকসেনারা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে না পড়ে ততক্ষন মুক্তই থাকবে। তারপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জানতে চান তিনি বাংলাদেশকে কিভাবে সাহায্য করতে পাড়েন? উত্তরে তাজউদ্দীন

সাহেব বলেছিলেন " বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনি (শ্রীমতী গান্ধী) যেন তার বিদেশী মিশনগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে এবং বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যাতে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করা হয় পাকিস্তানের উপর। আর ভারতের সীমান্ত যেন খোলে দেয়া হয় বাংলাদেশের জন্য সেখানে এককোটির উপরে মানুষ আশ্রয় নিতে পাড়ে, তিনি যেন এই মানুষগুলোর ভরণপোষণ এর দায়ীত্ব নেন, আরেকটা কথা তিনি জোরালো ভাবে বলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, আনসারের বাঙালি সদস্যরা রিভোল্ট করে হয়ত ইতিমধ্যেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের যেন অস্ত্র - গোলাবারুদ এবং প্রাশিক্ষণের জায়গা দিয়ে তিন সাহায্য করেন "। বঙ্গতাজের কথা

শুনে শ্রীমতী গান্ধী মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি সকল দিক থেকেই বাঙালিদের সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। শ্রীমতি গান্ধী তাজউদ্দীন সাহেবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন শীঘ্রই যেন সরকার গঠন করে শপথ নেওয়া হয়। দিল্লী থেকে ফিরে জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত সকল এমএনএ দের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরায় চলে আসার নির্দেশ প্রেরণ করেন এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী এমএনএ রা এপ্রিলের ১০ তারিখ আগরতলা সার্কিট হাউজে একত্রিত হোন। তারপর সেইদিন ই স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সরকার গঠন করা হয় যার কাঠামো টা ছিল ◌ঃ

রাষ্ট্রপতিঃ শেখ মুজিবর রহমান

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিঃ জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রীঃ জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ

মন্ত্রীঃ কেএম মন্সুর আলী
মন্ত্রীঃ খন্দকার মোশতাক
মন্ত্রীঃ কামরুজ্জামান
সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন কর্ণেল অবঃ আতাউল গণি ওসমানী কে।

তারপর এপ্রিলের ১৪ তারিখে তারা কলকাতা থিয়েটার রোডে স্থাপিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সচিবালয়ে ফিরে আসেন এবং শপথ গহণের তারিখ এবং স্থান অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে ঠিক করেন। প্রথম সিদ্ধান্ত হয়েছিল কুষ্টিয়া সীমান্তে শপথ অনুষ্ঠান হবে, পরবর্তীতে পাকিস্তান বাহিনীর বিমান হামলার কারণে স্থান পরিবর্তন করে মেহেপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন ঠিক করা হয়। ভৌগলিক দিক দিয়েও স্থানটি ছিলো সুরক্ষিত কারণ এর তিনদিক থেকেই ঘেরা ভারত। প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণের দিনটি একদম গোপন রেখেছিলেন ১৭ ই এপ্রিল

সকালে তিনি প্রকাশ করেন এবং তখনকার মেহেরপুর এর মহকুমা প্রশাসক তৌফিক ই ইলাহি কে নির্দেশ প্রদান করেন মঞ্চ প্রস্তুতের, বৈদ্যনাথতলা স্থানটি তখন ছিল একটি অজ পাড়াগাঁ, তৌফিক-ই-ইলাহি এবং সেখানকার মহকুমা পুলিশ কর্মকর্তা মাহমুদ সাহেব মিলে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় গ্রামথেকে কিছু চেয়ারটেবিল জোগাড় করেন এবং মঞ্চ নির্মাণের জন্য কয়েকটি চৌকি আনান এবং শেষ করেন মঞ্চ প্রস্তুতের কাজ। সকাল থেকেই আশেপাশের গ্রামথেকে সভাস্থলে জড়ো হতে থাকে মানুষ আর দুপুরের মধ্যেই প্রায় ৫ হাজার ছাড়িয়ে যায়, তারপর দুপুরের ঠিক পড়েই শপথ নেন স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং অই শপথ অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০জন বিদেশী সাংবাদিক ও উপস্থিত ছিলেন। তারপর ওই স্থানটির নামকরণ করা হয় মুজিবনগর।

স্বাধীনতার আজ ৪৭ বছর চলল এর মধ্যেই বিকৃত হয়ে যাচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশ এই দুটি শব্দ একে অপরের পরিপূরক। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতোনা এটাই সত্যি এটাই ইতিহাস আর বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমেদ ও ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ... ২৫ শে মার্চ রাত্রিতে বঙ্গবন্ধু তাকে যেসকল নির্দেশনা দিয়েছিলেন তিনি তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন। আজ বড় হতাশার সাথে বলতে হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনায় আত্মনিয়োগকারী জাতীয় চারনেতাকে নিয়ে আলোচনা হয়না বললেই চলে, হয়ত এমনি করে একদিন কালের আবর্তে হারিয়ে যাবেন মুজিবনগর সরকার তথা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর

নাম, শুধুই তিনি স্মৃতি হিসেবে রয়ে যাবেন তার পুত্রকণ্যাদের মাঝে না এমনটা হতে আমরা দিবনা... জাতিকে আমরা ভুলতে দিবনা মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমেদ কে।

পরিশেষে ধিক্কার জানাই অইসকল রাজনৈতিক দল এবং সেই দলের নেতাদের যারা ১৭ ই এপ্রিল পালন করেনা। কারণ ১৭ ই এপ্রিল ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে। আর এর মহানায়ক ছিলেন বঙ্গবন্‌ধুর একান্ত সহচর বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমেদ।। আমার এই লেখাটা আমি জনাব সোহেল তাজকে উতসর্গ করলাম।।

ফাঁকি দিয়ে আত্‌মগ◌োপন এ যতেে লাগলনে।